পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ- আলোচনার ভাবী - ১

বছর কয়েক আগে এক আদিবাসী- মার্কিন বন্ধু শিল্পী ও কবি ডেভিড- ব্যাপটিস্ট শিরো বললেন, "আচ্ছা আর্যনীল, আমরা এমন করতে পারিনা? না- লেখা বইয়ের আলোচনা প্রকাশ করা যায় না? পুস্তকালোচনার গোটা ব্যাপারটাকে আকাদেমিক করার বদলে সৃষ্টিশীল করে তোলা যায় না?" যেকোনো অভিনব ও সৃষ্টিশীল লেখার পক্ষ নেওয়াই আমার মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রথা থেকে সমস্ত রকমভাবে সরে যেতে মন চায় সবসময়, তাই ডেভিডের আলগাভাবে বলা কথাটা নিয়ে ভাবতে শুরু করি। পাশাপাশি বেশ কয়েক বছর ধরে তরুণ কবিরা প্রশ্ন করছে পুস্তকালোচনার স্বার্থকতা নিয়ে। কি হয় একটা বই আলোচনা করে? সে না বইয়ের বিজ্ঞাপন, না মেধাবী পাঠ, না বই- প্রকল্প, না- গবেষণা। শুধু কিছু লোকে জানতে পারলো বইটা বেরিয়েছে। কোনো পুস্তকালোচনায় একথাও জানানো হয় না বইটা কোথায় পাওয়া যাবে। তাহলে বুক- রিভিউ কি কাজে লাগলো কবির? অধিকাংশ বুক- রিভিউ বন্ধুকৃত্যে শেষ হয়। আবার এমনো দেখেছি যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অসমঞ্জ পাঠ দারুণ বইয়ের সর্বনাশ করে। এসব ভাবতে ভাবতে মনে হলো প্রকাশিতব্য বই নিয়ে আলোচনা করলে কেমন হয়? দুজন ঘনিষ্ঠ অতিতরুণ বন্ধুর দুটো পান্ডুলিপি তারা আমায় মতামতের জন্য পাঠায় কয়েকমাস আগে। এদের কবিতা আমায় ভাবায় খুব, অনেক অস্পষ্টতার নাগাল দেয়, অনেক প্রশ্ন মনে আনে। মতামত দেবার চেয়েও আমি বইগুলোর ছাত্র- পাঠক হয়ে উঠি এবং কবিদেরই পাল্টা প্রশ্ন করতে শুরু করে দিই। আগামী বইমেলায় বেরচ্ছে এই দুই ভাবী বই। অপঠিত কবিতার অপাঠ্য আলোচনাই হোক না আজ! ফর আ চেঞ্জ!

বইগুলোর নাম, মলাট কিছুই এখনো, এই লেখা তৈরি হবার সময় ঠিক হয়নি। যদিও বই "কৌরব" থেকে বেরোচ্ছে, তবু দূরে থাকার কারণে সেসব অনুপুঙ্খের আমি কিছুই এখনো জানিনা। সব্যসাচী সান্যালের এক- কবিতা বই। নাম সম্ভবত কবিতার নামেই হবে ধ'রে নিয়ে বলি – ব্র্যাকেট শহর। শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের সম্ভাব্য নাম - "বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ"। বলাই বাহুল্য এই নামই যে চূড়ান্ত তার কোনো ঠিক নেই। দুটো বইয়েরই মলাট এখনো অনির্ধারিত।

==========

"কোথায় আমার দেশ? আধখোলা চোখের ফাঁক দিয়ে কোনো দ্যুতি বা অশ্রু নয়,
ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসার মুহূর্তে,
চলমানতার কথাটাই জোর দিয়ে লিখে রাখেন ভিক্ষু! "

==========

প্রথমে "বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ"- এর প্রসঙ্গে আসি। কবিতাটা দীর্ঘ, অনুলম্ব, পর্বে পর্বে গড়িয়ে যায়। এর কিছু অংশ হয়তো নানা পত্রিকায় বেরিয়েছে। কিছু কৌরবের ১১১ নং সংখ্যায়, কিন্তু অনেকটাই অপ্রকাশিত, অনুপ্রেরণার ক্রমিকে লেখা। কবিতাটা যখন গড়ে উঠছে, পরিবিষয়ী কবিতার ব্লগে শুভ্র থেকে থেকে অংশবিশেষ প্রকাশ করতো। ব্লগে লেখার নানা সুবিধের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ - টাটকা বা নির্মীয়মান লেখার ওপর তৎক্ষণাত অভিমত পাওয়া যায় বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ পাঠক ও কিছু সম্পাদকেরও। লেখা নিয়ে কবি যেমন তার পাঠক- সম্পাদককুলের সাথে আলোচনা করতে পারে তেমনি একটা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াও পায় যা রচনাশুদ্ধির কাজে আসে। এই কবিতা যখন টুকরো টুকরো পড়ছি, তখনই ভাবতাম - কেন "বৌদ্ধ" এই লেখমালা ? ঠিক বুঝতে পারছিলাম না । অধার্মিক লোকেদের এইসব সমস্যা । আর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু একটা জিনিস মনে ঠেকছিলো - একাকিত্বের এক তীব্র আসক্তি নানা জায়গায় ধরা পড়ছিলো। যেমন কয়েকটা অংশ পড়া যাক -

> *শুধু সিদ্ধার্থের ছেড়ে যাওয়ার সময়টা নয় বরং জোর দিই অখন্ড বোধির দিনটায়, তখন কি বিকেল? গ্রীষ্মের প্রখরতার বুকে পাথুরে আকাশ। এইসব বিকেলগুলো স্পর্শযোগ্য নয়। দরিদ্রতম ব্রাহ্মণের স্নান করে সন্ধ্যারতির সামনে কোথাও কি একটা আম্রপল্লব খসেছিলো তার অনূঢ়া কন্যার নামে? পৃথিবী তৈরিতে ব্যস্ত লোকের সামনে ক্ষতমুখের আত্মীয়ের মত লুকিয়ে থেকেছে সে - কোথায় আমার দেশ? আধখোলা চোখের ফাঁক দিয়ে কোনো দ্যুতি বা অশ্রু নয়, ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসার মুহূর্তে, চলমানতার কথাটাই জোর দিয়ে লিখে রাখেন ভিক্ষু!*

শুধু ছায়ার কথা / ছায়ায় গিঁথে গিয়ে তার ভিতর থেকে/ শাঁস খুবলে শরীরে আটকে নেওয়ার আকুতি/
এই শ্রমণতা

এইভাবে ওলটাপালট সন্ধে সন্নিবদ্ধ তোদের স্থানাঙ্ক কোথায় নিবিড় বা সজলতা আমার সঙ্গেই এসে ভিড় করে আমি চুপচাপ গিটারের গায়ে অরিন্দমের স্টিকার বলি ফাঁকা হয়ে এসেছে মুক্তক নদী বা সীমানা লোপাট ঔজ্জ্বল্য নেই পিকনিকের পাশে অবিস্মরণীয় একটা বই আবিষ্কার করে নেওয়া আধুনিকাতায় আমি চিৎকার করেছে এই সন্ধের আমারই শিরায় খাবার পৌঁছে দিয়েছে

আসামাজিক হবার কারণে কিন্তু নির্জনতার পিপাসা নয় এটা বোঝা যাচ্ছিলো। আত্মানুসন্ধান ও স্বোপাসনার তাগিদে। আরো লক্ষ্য করছিলাম আত্মজিজ্ঞাসা থেকে শুভ্র কোনো স্থির উপলব্ধিতে পৌঁছবার আগ্রহ দেখায় না । জিজ্ঞাসাটাকে বাঁচিয়ে তাকে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে পরের অনুসন্ধানে চলে যায়। আবার বারংবার প্রতিফলনের আশ্রয় নিয়ে একভাবে ছেড়েও যেতে চায় না। জলে যেন ঢিল পড়েছে। সমকেন্দ্রিক নানা বৃত্ত বড়ো হচ্ছে, তাদের প্রতিফলিত বৃত্তের ওপর পড়ছে -

তবু ছেড়ে যাচ্ছিনা, তবু ধাপে ধাপে ভেঙে আসছি / আসঙ্গ নির্মাণ, পাশে থাকতে চাওয়া সঙ্গী,/ এক চড়াই পাখি দিয়ে ঢেকে থাকা দূরপাল্লার রেললাইন, // আর শরীর ঢেকে যাচ্ছে অনভিপ্রেত আয়নায় / প্রতিফলনে ঢেকে পড়া পাখিদের স্বরে বলে রাখব / ভূমিহীনতা

"শ্রমণ" সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু জানতাম না । পান্ডুলিপি পড়তে গিয়ে, কবির সাথে আলোচনাকালে ও পরবর্তী গবেষণার মাধ্যমে জানলাম। একটা সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে - "শ্রমতি তপস্যাতিতি শ্রমণঃ" – অর্থাৎ শ্রমণ সেই যে নিজেকে অতিক্রান্ত করে, নিজের থেকে বেরিয়ে এসে কঠোর তপস্যা ও ত্যাগধর্ম পালন করে। ভ্রাম্যমান এই শ্রমণদের মন নিরাবরণ হয় শুধু বস্তু- সম্পত্তি ত্যাগে বা বিরচনে নয়, স্থানাসক্তি নিবৃত্তিতেও। ফলে এক কঠিন শ্রমের ব্যাপার এখানে এসে যায়। বৌদ্ধ শ্রমণের দর্শন হিন্দু বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করে, বিশ্বাস করে যেকোনো মানুষের পক্ষেই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব। রীতি- আচার থেকে এই দর্শন দূরে থাকতে চায়, অস্বীকার করে সৃষ্টিদেবতাকে, প্রাকৃতিক শক্তির নেপথ্যে থাকা দেবত্বের ধারণাকেও। একটা অংশ আবার পড়া যাক –

"কোথায় আমার দেশ? আধখোলা চোখের ফাঁক দিয়ে কোনো দ্যুতি বা অশ্রু নয়,
ব্রাহ্মণের বেরিয়ে আসার মুহূর্তে,
চলমানতার কথাটাই জোর দিয়ে লিখে রাখেন ভিক্ষু! "

আমার কাছে ওপরের পংক্তিগুলোই "বৌদ্ধ লেখমালা"কে বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাবিকাঠি। ভ্রাম্যমান, মুক্তিকামী, বস্তুহীন নির্বাসন আসলে "দেশ"- এর ধারণাকে রগড়ে নষ্ট করছে। "দেশ"ও এক মেটিরিয়াল – বস্তু – তাকে ছেড়েই "ব্রাহ্মণ" "আত্মণ"- এর কাছে চলেছে [অদ্বৈতবাদ বেদান্তের ভাষায় বলি] – আজকের এই বৈশ্বিক দুনিয়ার নানা বেড়াকে অতিক্রম করে সমসাময়িক , বহুধর্মাবলম্বি ও বহুজ্ঞানশাখাবিস্তারি হয়ে উঠেছে শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৌদ্ধ শ্রমণ"।

বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্মাভ্যেসের মধ্যে একটা দূরত্ব আছে। একটা নিষ্ঠুরতা আছে, আছে এক প্রগাঢ় নির্জনের অঘোর বাসনা। আছে সাম্য ও মৈত্রীর অবলম্বন। সমস্ত অণু- পরমাণুকে একার্থে মিলিয়ে নেবার প্রয়াস। শুভ্র লিখছে -

তাহলে মাথা বা চিন্তাশক্তির ওপরে যে বিচ্ছিন্ন পাখির ডাক/ শিশুর ভাঙা রঙিন খেলনার টুকরো/ শব্দ উচ্চারণের পর চোখ বুজে অনুভব করে নেওয়া/ পুরাণ, বিপুলতা, দুর্গা, দীঘি

এই শ্রমণের প্রভাবে শুভ্রর কবিতার মধ্যে কেবল বিষয়গত বা ভাবনাগত একটা বহুগামিতাই আসছে না, স্থানান্তর, ব্রাজন ও ভ্রমণের স্বভাবেও একটা আত্মমগ্ন নির্জনতা আসছে। আর সেই সঙ্গে নির্বাসিতের চেতনা যা স্রেফ শিক্ষা বা পেশাগত কারণেই আজকের বাঙালি যুবক- যুবতীদের কাছে এক অপরিহার্য সত্য হয়ে উঠেছে। স্বোপাসনা বা আত্মধ্যান এমন একটা স্নায়বিকতার জায়গায় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে যেটা জটিল। কিন্তু তার একটা পরিষ্কার লক্ষ্য থাকছে, একটা একমুখিনতা, যা অত্যন্ত যুক্তিগত কারণে অনেকসময়ে বহুগামিতাকে নষ্ট করছে -

প্রতিবার জঙ্গমতা ঘিরে নেবার পরে
বারবার জটিল ও স্ববিরোধিতায়
অপমানে ত্যালত্যালে হয়ে থাকা স্নায়ুগুচ্ছ
আসলে একটা ধাতব বৃক্ষ
যার ভোঁতা কান্ডে ধাক্কা লেগে দৃষ্টি খেঁতলে গেছে

বহুগামিতার

শুভ্রর এই কবিতা অত্যন্ত জটিল, পরীক্ষামূলক, অলঙ্ঘ্য, যদিও এক আপাত সহজ স্বচ্ছতার ভানে নিজেকে জড়ায়; আর এই আপাত- সারল্য একটা বিরাট কাজ করে - পাঠককে স্বাচ্ছন্দ্য দেয় - সহজেই তার একটা ভালোলাগা জন্মায়, যদিও সে সব বুঝতে পারে না, সে কবিতার খাদের মধ্যে অনায়াসে নেমে যায়, বানের নদী ফুলে উঠুক বা নয়া উঠুক, স্লুইস- গেট খুলুক বা না খুলুক। ঝুঁকি নেওয়া কবিতাকে আমি সবসময় কুর্নিশ করি। কিন্তু অনেক তথাকথিত ঝুঁকি- নেওয়া কবিতা তার উদ্ভটত্বের নমুণার এমন অতিরিক্ত বহির্প্রকাশ করতে থাকে একেবারে প্রথম থেকেই; দশটা ভাবনার বা শাব্দিক কারিকুরির বল নিয়ে এমন জাগলারি শুরু করে দেয়; বা লেখার মুখ- গহ্বর এমন বাঁকিয়ে রাখে যে প্রবেশপথের হদিশ পাওয়াই ভার হয়ে দাঁড়ায়। এই জায়গায় শুভ্রর কবিতা বিরাটভাবে সফল। ভালো লাগুক বা না- লাগুক, কবিতার আধেয়র সাথে আমাদের অনুসন্ধিৎসার মিল থাকুক বা না থাকুক, কবিতা একটা সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করে, উপাসনার দিকে পাঠিকাকে, পাঠককে টানতে থাকে। খুব অরব, মৃদুভাষী এই কবিতা তার নিজের বর্ণনা করতে গিয়ে বোধহয় বলে -

একটা চুপচাপ একটা চুপচাপ
আলোক সরকার

"বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ "- এর ভাষা যাকে বলা যেতে পারে মধ্যম- ভাষা (median language)। অর্থাৎ বাংলা কবিতার স্বাভাবিক ভাষা। সেখানে কোনো নতুনতা বা পরীক্ষানিরীক্ষার সচেষ্ট প্রয়াস নেই। কেবল বাক্যের সিনট্যাক্সকে বদলানো হয়েছে অনেকটা, যদিও স্বচ্ছন্দ সে বদল। যেটা বইটাকে বিস্ময়কর করে তোলে সেটা হলো তার ভাষা ও ভাবনার অপ্রত্যাশা। সহজ পংক্তি ধরে এগোতে এগোতে এমন এক একটা বাক্য আসছে যা আমরা আশা করিনি একেবারেই, এমন এক একটা ভাবনা যার সাথে সাধারণ পাঠকের পরিচিতি কম। এইভাবেই পাতার পর পাতা গড়াতে গড়াতে বই এক একটা বিচিত্র আবিষ্কারের প্রকোষ্ঠে গিয়ে পৌঁছয় –

তবু ছেড়ে যাচ্ছিনা, তবু ধাপে ধাপে ভেঙে আসছি
আসঙ্গ নির্মাণ, পাশে থাকতে চাওয়া সঙ্গী,
এক চড়াই পাখি দিয়ে ঢেকে থাকা দূরপাল্লার রেললাইন,

আর শরীর ঢেকে যাচ্ছে অনভিপ্রেত আয়নায়
প্রতিফলনে ধরা পড়া পাখিদের স্বরে বলে রাখব
ভূমিহীনতা, একদিন অপেক্ষায় ছিল
একটানা শুদ্ধ সারঙের বিকেল ৩টে

ডাইগ্রেসিভ বা অবান্তরবাদী সব লেখা হয় না, না হওয়াই বোধহয় ভালো। কিন্তু কারো ভাবনার নিজস্বতার কারণে একটা আপাত- দুরুহতা আসে। এই বইয়ের ক্ষেত্রেও বোধহয় সে- কথা বলা যায়। ভাবনা লাফায় না, সরে সরে যায়, আবার কখনো একটানা স্রোতের মতোই অনবরত বাক্যের অভ্যন্তরেই পাল্টাচ্ছে –

এইভাবে ওলোট পালোট সন্ধে সন্নিবদ্ধ তোদের স্থানাঙ্ক কোথায় নিবিড় বা সজলতা আমার সঙ্গেই এসে ভিড় করে আমি চুপচাপ গিটারের গায়ে অরিন্দমের স্টিকার বলি ফাঁকা হয়ে এসেছে মুক্তক নদী বা সীমানা লোপাট করা ঔজ্জ্বল্য নেই পিকনিকের পাশে অবিস্মরণ একটা বই আবিষ্কার করে নেওয়া আধুনিকতায় আমি চিৎকার করেছে এই সন্ধের চামচ নাড়া আমারই শিরায় খাবার পৌঁছে দিয়েছে

"বৌদ্ধ লেখমালা" খুব সম্ভব এমন একটা বই হতে যাচ্ছে যা প্রতিবারের পাঠে একটু একটু করে বোঝে যাবে। প্রথম পাঠের পর কাজ করবে নানা বৌদ্ধ অতৃপ্তি। দ্বিতীয় পাঠ সেই ঘনবদ্ধতাকে একটু কমিয়ে আনবে, তৃতীয় পাঠে আরো – এইভাবে। আরো নানা ভাবনা রয়েছে গোটা কবিতা জুড়ে – যেমন "শ্রুতি" ও "প্রতি- শ্রুতি" নিয়ে কবির সুচিন্তা, লিঙ্গভাবনা, প্রেম, কবিতা বা শিল্পের অলঙ্কারহীনতার কথা, যার ইশারা ম্যানেকিনের পোশাক খুলে ফেলার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠানো হয়। তবু ভাবী বইয়ের অতিরিক্ত অনুপুঙ্খে না গিয়ে বরং আসি বইয়ের কয়েকটা বিশেষ প্রবণতায়।

দুটো শব্দ বারবার আসে - "মাংস" আর "ব্লেড"। কিন্তু প্রতিবারই এত ভিন্ন এই দুই প্রতীকের ব্যবহার যে তার কোন এক- চরিত্র ধরা যায়না। শেষে কৌতূহল আদম্য হলে কবির দ্বারস্থ হতে হয়। অবশ্য কবি যে সব সময় তার কবিতা সম্বন্ধে ঠিক উক্তি করেন, একথা আমি মনে করিনা। অনেক সময় কবি ভাবেন এক আর লেখেন সে ভাবনার আরেক রূপ। অথবা লেখার পর তার ভাবনার পরিবর্তন হয়। সেটাই লিখিত ভাবনার অনচ্ছতার ওপর সে আরোপ করে। "ব্লেড"- এর ব্যবহার বিশেষ করে আশ্চর্যরকম অভিনব। একমাত্র তুষার রায়কে বাদ দিলে আর কোন বাঙালী কবিকে এইভাবে "ব্লেড"- এর রূপককে আত্মসাৎ করতে দেখিনি। তুষার "ব্লেড" কে ধংসের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন যার মধ্যে অভিনবত্ব থাকলেও অস্বাভাবিকতা নেই। শুভ্রর আত্মানুসন্ধী মেডিটেটিভ কবিতায় "ব্লেড" রীতিমতো ধন্দে ফেলে দেবে সকলকে। যা কিছু গতিশীলতা, যা কিছু তার বস্তুত্বে প্রকট, "ব্লেড" যেন তাকে কেটে দেয়। এই ব্লেডকে কখনোই দাড়ি কামানোর ব্লেড বলে মনে হবেনা, মাংস কাটার চাকুর ব্লেড বরং। আরো লক্ষ্য করি বেশ কিছু পংক্তিতে একটা চূর্ণ রূপকতা আসে। কখনো শব্দ বা ধ্বনিবিজ্ঞানজাত বিচূর্ণতা –এক etymological grinding – যেখানে ধ্বনি, শব্দ, রূপক চূর্ণ হয়ে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বৌদ্ধ দর্শনে যে সাম্য বা মৈত্রীর কথা আসে, সেই দর্শন বুঝি ধরা পড়ে রচনাপদ্ধতিতে। সেই রকমভাবেই "মাংস"ও যেন সমস্ত জীবন ও বস্তুর অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, শুভ্রর সাথে মাংস ও ব্লেড নিয়ে কথাবার্তার পরেও এই দুই প্রতীক তাদের রহস্যের অনেকটাই হারাতে দিলোনা। আর এইটাই হয়তো ভালো কবিতার বিশেষ গুণ। আবার এও হয়তো সমান্তরালভাবে বলা যায় যে "মাংস" ও "ব্লেড" নানা অসংবদ্ধ ব্যবহারে তাদের প্রতীতীকে কিছুটা অস্পষ্ট করে ফেলে, এক জটিলতা এনে ফেলে তাদের ব্যবহারে যা হয়তো ঠিক তীর খুঁজে পেলো না । এসবের সূক্ষ্ম বিচার পাঠিকা/পাঠকের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। কয়েকটা উদাহরণ –

<u>মাংস</u>

1. *মাংসল রাস্তার কাছে দাঁড়াই*
2. *একাকার মাংসপিন্ড কোথায় যায় ?*
3. *যে লেখার বীজ দংশক মাংসে আজও কি ১টা মাঠ থাকে সাইকেল চালানো শেখার?*
4. *আপেলের মাংস ও দাঁত*
5. *ভোঁতা হচ্ছে মাংস আর ফুলে ফেঁপে ঢাউস*
6. *শুধু মাংসল থাবা শুধু উগ্রগন্ধ শুষ্ক চামড়া ঘষে সাদা*
7. *যদি মাংস জিভ ও লালাভতায় এত তীক্ষ্ণ লুকিয়ে*

<u>ব্লেড</u>

1. *শিরা ব্লেড ভারি রেললাইনের পাশে ছিটকে উঠবেনা হাত*
2. *ছাই ভাসানো পরিপার্শ্বে গোলাপের লুকনো ব্লেড নির্জনতা*
3. *পালিয়ে বেড়ানো ব্লেডের পালক নয়*
4. *এভাবে ব্লেডের হাওয়া বারবার ঘিরে নিলে / আমাদের জন্ম রোধ হয়*
5. *এই নিখিলের পাশে ব্লেড ও তারের ভাস্কর্য*
6. *রিবনের মত নেমে আসছে কোমরের নিচ থেকে/ পায়ের পাতায় ধারালো ব্লেড*

এই বইতে দু- একটা ক্লিশের ব্যবহার আমার চোখে পড়েছে, যা মন্দ না হলেও এই কবির বর্তমান লেখালিখির আপাদমস্তক ঔজ্জ্বল্যের সাথে বেমানান। যেমন – "দৃষ্টির ভেতর লিখি সাদা" , "চোখের বদলে লিখি বিক্ষত/ বৃক্ষের বদলে লিখি বিক্ষত" [যা অবধারিতভাবে স্বপন রায়কে মনে করায়। অনেক সময় ক্লিশের ব্যবহার অনিচ্ছাকৃত হয়। আমার মনে হয় এক্ষেত্রেও হয়তো তাই। তবু কবিকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।] বা "ব্যবহৃত স্তন" [জীবনানন্দ] বা "এই আকস্মিকতার নাম দিই ব্যকরণ" ইত্যাদি।

উত্তরাধুনিক রচনাপ্রবৃত্তির এক বহু- আলোচিত প্রবণতা আভ্যন্তরীন অসরলতা [নন- লিনিয়ারিটি] – অর্থাৎ লেখার বিষয়ভাবনা হয় লেখা নিজেই। উদাহরণস্বরূপ – " হালকা লাইনের চলন এড়িয়ে ভারি বিষয়ের কাছে থামে"। এই প্রবণতা বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও কারো কারো সাম্প্রতিক লেখায় প্রগলভ – যেমন আমি নিজে। এর থেকে হয়তো আমাদের দুজনেরই কিছুটা সরে আসার সময় এসেছে।

কবি – শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বইয়ের যে সমস্ত নাম ভাবা হয়েছে/হচ্ছে – বৌদ্ধ লেখমালা
অন্যান্য শ্রমণ
জোয়াকিম মন্ডলের কবিতা
সেসব দূরের লেখা
বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ
প্রকাশক – কৌরব
প্রকাশকাল – বর্তমানে যন্ত্রস্থ , আশা করা যাচ্ছে কলকাতা বইমেলা ২০১২- র সময় কৌরবের স্টলে পাওয়া যাবে। নতুবা এপ্রিল মাস নাগাদ কৌরব অনলাইনের বৈদ্যুতিন বইঘরে দেখুন।
উৎসর্গ – ভাস্বতীকে
যাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা ভাবা হচ্ছে - সব্যসাচী সান্যাল, সুদেষ্ণা মজুমদার, আংখেল গিন্দা, দাবিদ ফ্রান্সিসকো, প্রণব কুমার দে, মণীন্দ্র গুপ্ত, দেবারতি মিত্র, দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, বিওলেতা মেদিনা, মার্তা ফুয়েন্তেস, ভেরোনিকা আরান্দা ও সম্ভবত এই মুক্তগদ্যের লেখক।
মলাট – ঠিক হয়নি
পৃষ্ঠা সংখ্যা – ঠিক নেই